পরিক্রমা

‘অনন্ত রাধার মায়া...’

ভারতবর্ষ ভাবময়। কালের যাত্রার ধ্বনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে আধুনিক ভারত—নিরন্তর বদলে বদলে যাচ্ছে সে। সমান্তরালভাবে তার অন্তরে ফল্গুনদীর মতো বয়ে চলেছে একটি ভাবময়ী চেতনা। এই আন্তর সত্তাটিই যথার্থ ভারতসত্তা। এর জন্যই ভারত ‘ভারত’—ভা অর্থাৎ জ্যোতিতে রত, মগ্ন। মর্মে তার ধর্ম, কানে তার অনন্তের আহ্বান, আত্মাকে অধিকার করে সে আধ্যাত্মিক। ঐহিকতাকে অতিক্রম করে তার দৃষ্টি ঊর্ধ্বে, পরম ও চরমেই তার মন নিবদ্ধ। ভারতবর্ষের এই ভাবে-গড়া তনুর চিরন্তন প্রবণতাকে লক্ষ করেই আচার্য বিবেকানন্দ অমোঘ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন : বুড়ো শিব ষাঁড়ে চড়ে বেড়াবেন, কৃষ্ণ বাঁশি বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন—এদেশে চিরকাল। ভারত বিজ্ঞানে প্রযুক্তিতে যত অগ্রসরই হোক, শিবরাত্রি-জন্মাষ্টমী-কালীপূজা তাই আজও তার জাতীয় উৎসব।

ভারতের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে বোঝা যায়, তার অন্তশ্চারিণী ওই চেতনা কখনও কখনও শরীরিণী হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র, মা সীতা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, শ্রীচৈতন্য—এক দৃষ্টিকোণ থেকে অবতার, অপর দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের বহুযুগের কোটি কোটি হৃদয়ের নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় ভাবসাধনার অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ। অর্থাৎ তাঁদের আবির্ভাব আকস্মিক বা সমাপতন ছিল না, ছিল অনিবার্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণকে ‘ভারতবর্ষের দুহাজার বছরের অধ্যাত্মসাধনার পরিপূর্ণ রূপ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এঁরা ভাবময় ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র বছরের ভাবঘন মূর্তি।

আপাতত আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ শ্রীরাধার প্রতি। তাঁর অলোকসামান্য রূপ আর অলোকসম্ভব প্রেম নিয়ে আজও তিনি ‘থির বিজুরী’। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড আদিকবি বাল্মীকি সত্যিই রচনা করেছিলেন কি না এ-প্রশ্ন আজ যেমন অবান্তর, তেমনি অবান্তর রাধারানি সত্যিই ছিলেন কি না এ-প্রশ্নও। কারণ রামসীতা তাঁদের সমগ্র জীবন নিয়ে যেমন, তেমন শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধাও তাঁদের লীলামাধুর্য নিয়ে ভারত-সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গিয়েছেন। বহুযুগ ধরে তাঁদেরই অন্তরের মাধুরী মেখে কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয় স্পন্দিত হয়ে চলেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ‘রাধা’ নামটি পাওয়া যায় না; ‘অনয়ারাধিতঃ’—ভগবানকে ইনি ‘আরাধনা’ করেছেন—রাধ্‌ ধাতুর এই প্রয়োগটি থেকেই পণ্ডিতেরা ‘রাধা’কে খুঁজে নেন। নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে রাধা পূজারিনি। সাধারণ মানবমন রাধাকৃষ্ণলীলার মধ্যে মানবোচিত লীলাচাঞ্চল্যই খুঁজে পায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীভগবান ‘আরাধিত’ হয়েছেন রাধার কাছে এবং হয়েছেন ভগবদ্‌বুদ্ধিতেই। এই আরাধনাটুকুও আবার অভিন্ন এক সত্তারই দ্বৈতপ্রকাশের পর—যে-দ্বৈতত্বের কারণ নিজের মাধুর্যরস নিজেই আস্বাদনের ইচ্ছা। তাঁরা উভয়ে এক অখণ্ড অস্তিত্ব। তবে মানুষের দৃষ্টিতে তাঁদের দ্বৈধতা কেন? কারণ তাঁরা ‘‘দুই দেহ ধরি/ অন্যোন্যে বিলসে, রস আস্বাদন করি।’’

সেজন্যই রাধারানি কৃষ্ণময়ী। উপনিষদের ঋষি ঘোষণা করেছিলেন : ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করেছেন বলে মানুষ ‘পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মন্‌’—বাইরের বিষয়গুলিকেই দেখে, অন্তরাত্মার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। মানুষকে কেমন করে স্বরূপের দিকে তাকাতে হবে, সেটি দেখানোর

জন্যই বুঝি শ্রীরাধার কায়া ধরে পৃথিবীতে আসা। হয়তো সেজন্যই শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলনে গৃহে, সমাজে এত বাধার লীলা-অভিনয়! শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ইষ্ট—ঈপ্সিততম—একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। অন্তরে তিলমাত্র বিচ্ছেদ নেই তাঁর সঙ্গে—তাই কৃষ্ণভিন্ন কোনও ভাবনার স্থান নেই তাঁর মনে। শ্রীভগবানের চিন্তা এতদূর তাঁর মনকে অধিকার করে রাখে যে, নিজদেহ—যা শরীরধারী জীবের বৃহত্তম বন্ধন—তাও তাঁর মনে বিন্দুমাত্র ছায়া ফেলে না। এ-কারণেই দেহবোধটুকুও নেই তাঁর। অনুভব করতে পারেন না এমনকী ক্ষুধা-তৃষ্ণাও। অধিকাংশ সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণস্মরণে অচেতনপ্রায় বলে বৈষ্ণবশাস্ত্রগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্যদশা, অন্তর্দশা—এই তিনটি অবস্থাতেই তাঁর স্থিতি; সঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার। ভাষান্তরে, সমাধির বিভিন্ন দশা নিরন্তর খেলা করে তাঁর অন্তর্জগতে।

শিশু যেমন তার নিজের ছায়ার সঙ্গে খেলে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের লীলা—এই-ই ভাগবতের উপমা। এই বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের লীলামাধুর্য সমাজ বোঝে না বলেই সে-লীলার সংরচন অতি গোপনে—যখন অন্য সকলের 'নিশা'। 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী'—জীবের পক্ষে যা নিদ্রাকাল—রাত্রি, সেই অচিন্ত্য স্বরূপে জাগ্রত থাকেন সংযমী। সে-স্বরূপে চিরজাগ্রত থাকেন শ্রীভগবান ও তাঁর শক্তি। লোকচক্ষুর মলিন স্পর্শ সহ্য করতে পারে না তাঁদের অতি পবিত্র, অতি পেলব ভাব। তাই প্রকাশ্য দিবালোক নয়, রাতের আঁধারই সে-লীলার প্রশস্ত কাল। মহানিশার সে-দৈবী লীলায় আলো ধরেন চন্দ্রদেব। 'জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ' বলে জ্যোৎস্নারূপিণী চন্দ্ররূপিণী মহাদেবীকে বন্দনা করেছেন মার্কণ্ডেয়পুরাণ। দেবীশক্তি মাতৃশক্তি—তা সৃজনকারিণী, পালনকারিণী। তাই শস্যখেতে জ্যোৎস্না পড়লে শস্যের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটে। সন্ন্যাসীর শক্তি তার বিপরীত, তাই সন্ন্যাসীর পক্ষে জ্যোৎস্না নিষিদ্ধ। অথচ সেই চন্দ্রই স্থিতপ্রজ্ঞ অবতারপুরুষের লীলার পুষ্টিসাধন করেছেন স্বচ্ছন্দে। চন্দ্র মনের দেবতা। রাধাকৃষ্ণের সর্বোত্তম লীলা বলে প্রসিদ্ধ রাসলীলা ঘটেছিল পূর্ণিমায়। পূর্ণিমা তিথিতে ষোলোকলায় পরিপূর্ণ চন্দ্রের শক্তি সর্বোচ্চ। তুঙ্গশক্তি চন্দ্রদেব নিজের গতি ভুলে স্তম্ভিত হয়ে রাসনৃত্য দেখেছিলেন, তাই সে-রজনী হয়েছিল অতিদীর্ঘ। কালীপূজা হয় অমাবস্যা তিথিতে, যখন চাঁদ নেই অর্থাৎ মনের শক্তি শূন্য। শক্তিহীন মনের কামনা-বাসনাকে দলন করে শক্তিরূপিণী জগজ্জননী ভয়ংকরী রূপে লীলা করেন। অথচ তিনি যখন অসি ফেলে বাঁশি নিয়ে দাঁড়ান, তখন তাঁর মধুর রূপ, মোহন হাসি অভিভূত করে দেয় ষোলোকলায় পূর্ণশক্তি চন্দ্রকেও। এক অক্ষাংশ পরিক্রমণের শক্তিও অবশিষ্ট থাকে না তাঁর। এ যে অভাবনীয় পরাভব! মনের দেবতারও মন মথন করে বিজয়ী হয় রাধাকৃষ্ণলীলা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁর অন্তরে, দেহের সীমায় তাঁর মন নামে কই! রাধার ''কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।'' কৃষ্ণভাবিনী সখীরা যখন তাঁকে সাজিয়ে দেন, তখন 'এ-সজ্জা কৃষ্ণবিলাসেরই জন্য'—এই ভেবেই তাঁর তৃপ্তি। শিশু তার প্রতিবিম্বের সঙ্গে যেমন খেলে—এই উপমায় ভাগবত যে শুধু রাধাকৃষ্ণের ঐকাত্ম্য বুঝিয়েছেন তা-ই নয়, প্রকাশ করেছেন শিশুসুলভ নিষ্কামত্বও। শিশুর মতো দেহবোধহীন অনাবিল মন নিয়ে শ্রীভগবান নিজ শক্তির সঙ্গে লীলা করেন। মানবোচিত লীলা অথচ তাতে মানবলীলার প্রধান উপকরণ দেহবুদ্ধিটিই নেই! আত্মসচেতনতা মানুষের মনকে ভগবানের থেকে সরিয়ে দেয়, তাতে তার সৌন্দর্যের হানি ঘটে। রাধাকৃষ্ণলীলায় স্বয়ং শ্রীভগবান ও তাঁর শক্তি দেহধারণ করে লীলাতৎপর, তদুপরি উভয় অস্তিত্বই দেহবিস্মৃত, এজন্য তাঁদের অপার্থিব সৌন্দর্য দেখে

''মদন মুরুছা যায়।'' কোনও রসিকজন রাধার মহিমা ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, ''রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ''—কৃষ্ণ যখন রাধার সঙ্গে থাকেন তখনই তিনি মদনমোহন, অন্যথায়, নিজে বিশ্বকে মোহিত করে রাখলেও তিনি স্বয়ং মদনমোহিত।

অবচেতনেও কৃষ্ণ ব্যতীত চিন্তার লেশ নেই বলে, যেটুকু পার্থিব বিষয়ে সামান্যতম মন যায় সেগুলিও কৃষ্ণ-সম্পর্কিত রূপেই প্রতিভাত হয় শ্রীরাধার মনে। তমালবৃক্ষ দেখে ভাবেন ইনি কৃষ্ণ, ঘাসে মোড়া ভূমি দেখে মনে করেন কৃষ্ণ হেঁটে গিয়েছেন বলে রোমাঞ্চিত হয়ে রয়েছে পৃথিবী। তাঁর নিজের পৃথক অস্তিত্বের সচেতনতা তাঁর কৃষ্ণমগ্ন সত্তায় অনধিকার প্রবেশ করতে পারে না। হয়তো এইজন্যই, শ্রীমা সারদা দেবী এক বালককে রাধারূপে দর্শন দেওয়ার পর বলেছিলেন, ''আবার যদি এঁকে দেখ, মা বলে ডেকো না।'' অর্থাৎ মাতৃসম্বোধন শোনার মতো কান এবং শুনে তদনুরূপ আচরণ করার মতো মন রাধার মধ্যে কোথায়? মনে পড়ে শ্রীরাধার বয়ানে সেই গান : ''ইন্দ্রিয় সকলে চলে গেল/ আমি একলা কেন বা রলাম গো!'' কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত নিজস্ব বিন্দুমাত্র সত্তাই তো তাঁর অবশিষ্ট নেই! অথচ মাতৃসম্বোধন করে তাঁর সন্তান সেই দেবীর কাছে কৃপা, প্রসন্নতা পাবে না—এই চিন্তা শ্রীশ্রীমার কাছেও অসহনীয়। তাই বোধ করি সন্তানকে তাঁর ওই সতর্কবার্তা!

পূর্ব অবতারে যিনি রাধারূপিণী, নবতম দেহধারণেও তাঁর পূর্বলীলার চকিত প্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করে রাখে। দেবী শীতলার পূজারি ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীমার মধ্যে রাধারানিকে প্রত্যক্ষ করে উচ্চারণ করেছিলেন : ''বন্দে রাধাম্ আনন্দরূপিণীম্।'' ডাক্তার প্রমদা দত্ত উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে ফিরে গিয়ে সানন্দে বলেছিলেন, তিনি রাধারানিকে দর্শন করে এসেছেন। ''মা,... আপনার জপ কি করে করব?''—জনৈক ভক্তের এই প্রশ্নে মা উত্তর দেন : ''রাধা বলে পার, কী অন্য কিছু বলে পার, যা তোমার সুবিধা হয় তাই করবে। কিছু না পার, শুধু মা বলে করলেই হবে।'' বৃন্দাবনে থাকাকালীন প্রায়ই মায়ের সমাধি হত, এবং তাঁর বাহ্যচেতনা ফেরাতে সঙ্গীরা রাধানাম শোনাতেন। সেইসময় একটি প্রশ্নের উত্তরে মা স্পষ্টই আত্মস্বরূপ ঘোষণা করেছিলেন : ''আমিই রাধা।''

বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাধা পরমাত্মার 'হ্লাদিনী' অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তি। সত্যিই, যুগ যুগ ধরে আনন্দ বিধান করে আসছেন এই কিশোরী নন্দিনী। ভক্ত হয়ে আনন্দ দিচ্ছেন ভগবানকে, জীবাত্মা হয়ে পরমাত্মাকে; আবার ভগবানের শক্তি হয়ে আনন্দ বিতরণ করছেন সহস্র ভক্তহৃদয়ে। তাঁর নিজের জীবন দুঃখে মোড়া, অশ্রুতে গাঁথা, তবু কত মধুর কত আনন্দময় তাঁর লীলা-সংঘটন! জগদ্‌বিস্মৃত ঈশ্বরপ্রেমে, বৃক্ষলতা-পুষ্প-নদী-অরণ্য-পশুপাখির সমবায়ে সে-লীলা অপরূপ, মায়াময়! ভগবানের জন্য রাধার প্রণয়মহিমা কেমন, জানতে ও জগতকে জানাতে শ্রীভগবানকে আবার অবতার হয়ে আসতে হয়েছে—রাধাভাবের দ্যুতি-সুবলিত তনু নিয়ে। উনিশ শতকে নবীনতম অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ মধুরভাবে সাধন করেছেন, জীবনভোর রাধাকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন শুনে রসাস্বাদন করেছেন। সংগীতে প্রকাশ করেছেন উপলব্ধি : ''অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।'' নিজের বার্তাবহ নরেন্দ্রনাথকে নিজদেহে রাধারূপ দর্শন করিয়েছেন। প্রেমসাগরের এই মহাতরঙ্গগুলিকে আশ্রয় করেছে প্রেমস্বরূপিণীর মায়া, তাঁর মহাভাব। ভাবতনুকে কালের কালিমা স্পর্শ করতে পারে না। যুগযুগান্তের যবনিকা ভেদ করে আজও জেগে আছে শ্রীরাধার প্রেম, অশ্রু, বিরহদহন। জেগে আছে তাঁর লোকোত্তর লীলা, যা কোনও কোনও ভাগ্যবানই শুধু 'দেখিবারে পায়', যার সাক্ষী হতে বুঝি জেগে থাকে প্রতিটি নিশীথ, তৃণ-প্রাণী-চন্দ্রমা সহ।